শরহুল আকীদাহ আল-ওয়াসেতীয়া

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ২১ - আল্লাহর জন্য কালাম (কথা বলা বিশেষণ) সাব্যস্ত করা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ সালেহ ফাওযান [অনুবাদ: শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী]

আল্লাহর জন্য কালাম (কথা বলা বিশেষণ) সাব্যস্ত করা

٢١- إثبات الكلام لله تعالى

২১- আল্লাহর জন্য কালাম (কথা বলা বিশেষণ) সাব্যস্ত করা:

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾

‘‘আল্লাহ তিনিই যিনি ছাড়া অন্যকোন সত্য ইলাহ নেই। তিনি তোমাদের সবাইকে কিয়ামতের দিন একত্র করবেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। আর আল্লাহর কথার চেয়ে বেশী সত্য আর কার কথা হতে পারে? (সূরা নিসাঃ ৮৭) আল্লাহ তাআলা সূরা নিসার ১২২ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾

‘‘আর যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তাদেরকে আমি এমন সব জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার নিম্নদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তারা সেখানে থাকবে চিরস্থায়ীভাবে। এটি আল্লাহর সত্য ওয়াদা। আর আল্লাহর চেয়ে বেশী সত্যবাদী আর কে হতে পারে?’’ আল্লাহ তাআলা সূরা মায়িদার ১১৬ নং আয়াতে আরো বলেনঃ

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾

‘‘স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন আল্লাহ বলবেন, হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা! তুমি কি লোকদের বলেছিলে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে ও আমার মাকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করো? তখন সে জবাব দেবে, সুবহানাল্লাহ! যে কথা বলার কোন অধিকার আমার ছিলনা সে ধরনের কথা বলা আমার জন্য ছিল অশোভনীয় ও অসঙ্গত। যদি আমি এমন কথা বলতাম তাহলে নিশ্চয়ই তোমার তা জানা থাকতো। আমার নফসে যা আছে তা তুমি জানো। কিন্তু তোমার নফসে যা আছে আমি তা জানি না, তুমি তো গায়েবের সমস্ত জ্ঞান রাখো’’। আল্লাহ তাআলা সূরা আনআমের ১১৫ নং আয়াতে আরো বলেনঃ

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

‘‘সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে তোমার রবের কথা পূর্ণাঙ্গ, তাঁর কালেমাসমূহ পরিবর্তন করার কেউ নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা’’। আল্লাহ তাআলা সূরা নিসার ১৬৪ নং আয়াতে আরো বলেনঃ

﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾

‘‘এর পূর্বে যেসব নবীর কথা তোমাকে বলেছি তাদের কাছেও আমি অহী পাঠিয়েছি এবং যেসব নবীর কথা তোমাকে বলিনি তাদের কাছেও। আল্লাহ মূসার সাথে কথা বলেছেন ঠিক যেমনভাবে কথা বলা হয়’’। আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারার ২৫৩ নং আয়াতে বলেনঃ

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾

‘‘এসব রাসূলদের কাউকে অন্য কারো উপর আমি অধিক মর্যাদাবান করেছি। তাদের কারোর সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, কারো মর্যাদা তিনি অনেক উন্নীত করেছেন’’। আল্লাহ তাআলা সূরা আরাফের ১৪৩ নং আয়াতে বলেনঃ

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

‘‘অতঃপর মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলো এবং তার রব তাঁর সাথে কথা বললেন, তখন সে আবেদন জানালো, হে আমার প্রভু! আমাকে তোমার দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখবো। তিনি বললেনঃ তুমি আমাকে দেখতে পাবেনা। হ্যাঁ পাহাড়ের দিকে তাকাও। সেটি যদি নিজের জায়গায় স্থির থাকতে পারে তাহলে অবশ্যই তুমি আমাকে দেখতে পাবে। কাজেই তাঁর রব যখন পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলো। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে মূসা বললোঃ পবিত্র তোমার সত্তা। আমি তোমার কাছে তাওবা করছি এবং আমিই সর্বপ্রথম মুমিন’’। আল্লাহ তাআলা সূরা মারইয়ামের ৫২ নং আয়াতে বলেনঃ﴿وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴾ ‘‘আমি তাকে তাঁর ডান দিকের তূর পাহাড়ের দিক থেকে ডাকলাম এবং গোপন আলাপের মাধ্যমে তাকে নৈকট্য দান করলাম’’। আল্লাহ তাআলা সূরা শুআরার ১০ নং আয়াতে বলেনঃ﴿ وَإِذْنَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾‘‘যখন তোমার রব মূসাকে ডেকে বলেছিলেনঃ যালেম সম্প্রদায়ের কাছে যাও’’। আল্লাহ তাআলা সূরা আরাফের ২২ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

‘‘যখন তারা সেই গাছের ফল আস্বাদন করলো, তাদের লজ্জাস্থান পরস্পরের সামনে খুলে গেলো এবং তারা নিজেদের শরীর ঢাকতে লাগলো জান্নাতের পাতা দিয়ে। তখন তাদের রব তাদেরকে ডেকে বললেনঃ ‘‘আমি কি তোমাদের এ গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করিনি এবং তোমাদের বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?’’ আল্লাহ তাআলা সূরা কাসাসের ৬৫ নং আয়াতে বলেনঃ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ স্মরণ করো সেদিনের কথা, যেদিন তিনি তাদেরকে ডাকবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা রাসূলদের কী জবাব দিয়েছিলে?’’ আল্লাহ তাআলা সূরা তাওবার ৬ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ﴾

‘‘আর যদি মুশরিকদের কোন ব্যক্তি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পারে, তাহলে তাকে আল্লাহর কালাম শ্রবণ করা পর্যন্ত আশ্রয় দাও। অতঃপর তাকে তার নিরাপদ জায়গায় পৌছিয়ে দাও’’। কেননা এরা একটি অজ্ঞ সম্প্রদায়’’। আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারার ৭৬ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

‘‘অথচ তাদের একটি দল এমন ছিল, যারা আল্লাহর কালাম শ্রবণ করতো। অতঃপর তা খুব ভালো করে জেনেবুঝে সজ্ঞানে তার মধ্যে তাহরীফ বা বিকৃতি সাধন করতো’’। আল্লাহ তাআলা সূরা ফাতাহএর ১৫ নং আয়াতে বলেন,

﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ﴾

‘‘তোমরা যখন গণীমাতের মাল লাভ করার জন্য যেতে থাকবে তখন পিছনে থেকে যাওয়া লোকেরা তোমাকে অবশ্যই বলবে যে, আমাদেরকেও তোমাদের সাথে যেতে দাও। এরা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করে দিতে চায়। এদের বলে দাওঃ তোমরা কখনই আমাদের সাথে যেতে পারবেনা, আল্লাহ তো আগেই এ কথা বলে দিয়েছেন’’। আল্লাহ তাআলা সূরা কাহাফের ২৭ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾

‘‘হে নবী! তোমার রবের কিতাবের মধ্য থেকে যাকিছু তোমার উপর অহী করা হয়েছে তা তুমি পাঠ করে শুনিয়ে দাও। তাঁর কালেমা পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেই’’। আল্লাহ তাআলা সূরা নামলের ৭৬ নং আয়াতে বলেন,

﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾

‘‘যথার্থই এই কুরআন বনী ইসরাঈলের জন্য বেশির ভাগ এমনসব কথার স্বরূপ বর্ণনা করে, যেগুলোতে তারা মতভেদ করে’’।

ব্যাখ্যাঃ আর আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে? অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কেউ নেই। আয়াতে যে প্রশ্ন করা হয়েছে তা হচ্ছে ইস্তেফহামে ইনকারী তথা অস্বীকারের প্রশ্ন। আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কেউ থাকাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে।

حديثا কথায়ঃ অর্থাৎ কথায়, সংবাদ প্রদানে, আদেশ করায়, ওয়াদা-অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কেউ নেই।

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا আল্লাহর চেয়ে বেশী সত্যবাদী আর কে হতে পারে? القيل হচ্ছে قال يقول এর মাসদার। এটি القول এর অনুরূপ। এই আয়াতাংশের অর্থও পূর্বের আয়াতের মতই। আল্লাহর কথার চেয়ে অধিক সত্য আর কারো কথা নেই এবং আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদীও আর কেউ নেই।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে আল্লাহ তাআলার জন্য حديث ও قيل অর্থাৎ কথা বলা বিশেষণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং এতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য কালাম (কথা বলা) সাব্যস্ত করা হয়েছে।

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ আল্লাহ যখন বলবেন, হে মারইয়ামের পুত্র ঈসাঃ অর্থাৎ স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন আল্লাহ তাআলা বলবেনঃ হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা! অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা ঈসাকে এই কথা বলবেন। যেসব নাসারা ঈসা এবং তাঁর মাতা মারইয়ামের এবাদত করছে, এই কথার মাধ্যমে তাদেরকে ধমক দেয়া হয়েছে। এটি পূর্বের আয়াতদ্বয়ের মতই। এখানেও আল্লাহ তাআলার জন্য

কথা বলা সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিনি যখন ইচ্ছা কথা বলেন।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا "সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে তোমার রবের কথা পূর্ণাঙ্গঃ এখানে কালেমা দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কালাম উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলা তাঁর সংবাদের ক্ষেত্রে সত্যবাদী এবং হুকুম-আহকামে ইনসাফকারী। صدقا এবং عدلا এই শব্দ দু'টি তামীয হিসাবে মানসুব হয়েছে। এই আয়াতেও আল্লাহ তাআলার জন্য কালাম সাব্যস্ত করা হয়েছে।

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا আল্লাহ মূসার সাথে কথা বলেছেন ঠিক যেমনভাবে কথা বলা হয়ঃ এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুসা (আঃ)কে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা মুসার সাথে কথা বলেছেন এবং সেই কথা মুসাকে শুনিয়েছেন। এ জন্যই মুসা (আঃ)কে কালীমুল্লাহ বলা হয়। মুসার সাথে আল্লাহর কালাম (কথা বলা) থেকে রূপকার্থের সম্ভাবনা দূর করার জন্য تكليما মাসদারকে তাগিদ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতেও আল্লাহর জন্য কালাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিনি মুসা (আঃ)এর সাথে কথা বলেছেন।

مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ তাদের কারো সাথে আল্লাহ কথা বলেছেনঃ অর্থাৎ রাসূলদের কারো কারো সাথে আল্লাহ তাআলা কথা বলেছেন। বিনা মধ্যস্থতায় সরাসরি কথা বলেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মূসা এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলেছেন। এমনি আদম (আঃ)এর সাথেও কথা বলেছেন। সহীহ ইবনে হিববানে এই মর্মে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এই আয়াতে আল্লাহর জন্য কালাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিনি কতক রাসূলের সাথে অতীতে কথা বলেছেন।[1]

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُঅতঃপর মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলো এবং তাঁর রব তাঁর সাথে কথা বললেনঃ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মুসার আগমণের জন্য যেই সময় নির্ধারণ করলেন, মূসা ঠিক সেই নির্ধারিত সময়েই উপস্থিত হলো। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে কথা বললেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বিনা মধ্যস্থতায় মুসাকে তাঁর কথা বললেন। সুতরাং এই আয়াতেও আল্লাহর জন্য কালাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা যখন ইচ্ছা কথা বলেন। তিনি বিনা মধ্যস্থতায় মুসার সাথে কথা বলেছেন।

وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا আমি তাকে তাঁর ডান দিকের তূরের দিক থেকে ডাকলাম এবং গোপন আলাপের মাধ্যমে তাকে নৈকট্য দান করলামঃ আল্লাহ তাআলা মূসাকে ডাক দিয়েছেন। উঁচু আওয়াজে ডাক দেয়াকে النداء বলা হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁকে তূর পাহাড়ের দিক থেকে ডাক দিয়েছেন। মাদায়েন শহর এবং মিশরের মাঝখানের একটি পাহাড়ের নাম তুর। মুসা (আঃ) যখন আগুন দেখে তা থেকে একটি জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে গেলেন তখন মুসার ডান দিক থেকে ডাক দেয়া হল। এখানে পাহাড়ের ডান দিক উদ্দেশ্য নয়। কেননা পাহাড়ের কোন ডান-বাম হয়না। আর আমি মুসার সাথে চুপিসারে কথা বলার জন্য তাঁকে নৈকট্য দান করলাম। نجيا শব্দটি مناجيا অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ চুপিসারে কথা বলার জন্য মুসাকে আমার নৈকট্য দান করলাম। মুনাজাত মুনাদার (উঁচু আওয়াজে আহবানের) বিপরীত।

এই আয়াতে কারীমার মধ্যে আল্লাহর জন্য কালাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা উঁচু আওয়াজে ডাক দেন, আহবান করেন এবং চুপিসারেও কথা বলেন। ডাক দেয়া এবং মুনাজাত করা (নীচু আওয়াজে কথা বলা) কালামের (কথা বলার) দু'টি প্রকার। ডাক দেয়া সাধারণত উঁচু আওয়াজে হয় আর মুনাজাত নীচু আওয়াজের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ যখন তোমার রব মূসাকে ডেকে বলেছিলেন, যালেম সম্প্রদায়ের কাছে যাওঃ অর্থাৎ তাদেরকে পাঠ করে শুনাও সেই ঘটনা অথবা স্মরণ করো সেই সময়ের ঘটনা, যখন তোমার রব মুসাকে ডেকে বলেছিলেন। আহবান করাকে النداء বলা হয়। أن ائت এখানে أن অব্যয়টি أن مفسرة এবং أن مصدرية উভয়ই হতে পারে। অর্থাৎ اذهب إلى القوم الظالمين তুমি যালেম সম্প্রদায়ের কাছে যাও। ফেরাউন সম্প্রদায়কে যালেম বলার কারণ এই যে, তারা কুফুরীর যুলুম এবং পাপাচারের যুলুমকে নিজেদের মধ্যে একত্র করেছিল। কুফুরীর মাধ্যমে তারা নিজেদের নফসের উপর যুলুম করেছিল এবং পাপাচার ও নির্যাতনের মাধ্যমে তারা অন্যদের উপর যুলুম করেছিল। যেমন তারা বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করে রেখেছিল এবং তাদের ছেলে সন্তানদেরকে হত্যা করেছিল।

এই আয়াতে কারীমাতেও আল্লাহ তাআলার জন্য কালাম (কথা) সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যার সাথে ইচ্ছা কথা বলেন এবং তাকে স্বীয় কথা শুনিয়ে দেন।

وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ তখন তাদের রব তাদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করিনিঃ আল্লাহ তাআলা আদম ও হাওয়া (আঃ)কে এই বলে ডাক দিলেন যে, আমি কি তোমাদেরকে ঐ গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করিনি? অর্থাৎ ঐ গাছের ফল খেতে নিষেধ করিনি? এই কথার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাদের দুইজনকে ধমক দিয়েছেন। কেননা তাদেরকে যেই বস্তু হতে সাবধান করা হয়েছিল, তা থেকে তারা বিরত থাকে নি।

এই আয়াতেও আল্লাহ তাআলার জন্য কালাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। আরো সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ হতে আদম ও তাঁর স্ত্রী হাওয়ার জন্য ডাক এসেছিল।

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ আর তারা যেন ভুলে না যায় সেদিনের কথা, যেদিন তিনি তাদেরকে ডাকবেন এবং জিজ্ঞেস করবেনঃ তোমরা রাসূলদের কী জবাব দিয়েছিলে? অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন এই মুশরেকদেরকে ডাক দিবেন এবং বলবেনঃ তোমরা রাসূলদেরকে কী জবাব দিয়েছিলে? যেসব নবীকে তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছিল, তারা যখন তোমাদের কাছে আমার রেসালাত পৌঁছিয়ে দিয়েছিলো তাদেরকে কী জবাব দিয়েছিলে?[2]

এই আয়াতেও আল্লাহর জন্য কালাম (কথা বলা) সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন মানুষকে ডাক দিবেন।[3]

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ আর যদি মুশরিকদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেঃ অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! যেসব মুশরেকের সাথে তোমাকে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, তাদের কেউ যদি আল্লাহর কালাম শ্রবণ করার জন্য তোমার কাছে আসতে চায়, তোমার নিরাপত্তা কামনা করে এবং আশ্রয় চায়, তুমি তাকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দান করো। حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ "যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়"। অর্থাৎ তোমার জবানীতে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে এবং তুমি যে বিষয়ের প্রতি আহবান করছো, তার প্রকৃত অবস্থাও বোধগম্য হয়।

এই আয়াত থেকেও আল্লাহ তাআলার কালাম (কথা বলা বিশেষণ) রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ আমরা যা তেলাওয়াত করি, তা আল্লাহর কালাম।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ **وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ** তাদের মধ্যে একটি দল ছিলঃ এটি হচ্ছে ইহুদীদের দল। فريق শব্দটি اسم جمع এই শব্দের কোন একবচন নেই। তারা আল্লাহর কালাম শ্রবণ করতো। এখানে কালাম দ্বারা তাওরাত উদ্দেশ্য। ইহুদীরা তাওরাতের আয়াত শ্রবণ করতো। অতঃপর তারা উহার মধ্যে বিকৃতি সাধন করতো। অর্থাৎ তারা আসল ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে অন্য ব্যাখ্যা করতো।

مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ তারা খুব ভালো করে জেনে বুঝে সজ্ঞানে তার মধ্যে তাহরীফ বা বিকৃতি সাধন করতোঃ অর্থাৎ ভাল করে জেনে-বুঝে তারা তাওরাতের বিপরীত আমল করতো। তারা ভাল করেই জানতো যে, তারা যেই তাহরীফ বা পরিবর্তন করছে এবং যেই অপব্যাখ্যা করছে, তাতে তারা অপরাধী।

এই আয়াতে কারীমা থেকেও আল্লাহর কালাম আছে বলে প্রমাণিত হচ্ছে। তাওরাতও আল্লাহর কালামের অন্তর্ভূক্ত। আর ইহুদীরা তাওরাতের মধ্যে তাহরীফ করেছে, উহার মধ্যে পরিবর্তন ও রদবদল করেছে।

يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ এরা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করে দিতে চায়। এদের বলে দাওঃ তোমরা কখনই আমাদের সাথে যেতে পারবেনা, আল্লাহ তো আগেই এ কথা বলে দিয়েছেনঃ এখানে পিছনে থেকে যাওয়া ঐ সমস্ত গ্রাম্য লোক উদ্দেশ্য, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জিহাদে বের না হয়ে পরিবার-পরিজন ও নিজেদের কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। হুদায়বিয়ার বছরও তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের না হয়ে নিজেদের গৃহে বসেছিল। তারা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করতে চায়। অর্থাৎ তারা আল্লাহ তাআলার সেই কথাকে পরিবর্তন করতে চায়, যার মাধ্যমে তিনি হুদায়বিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, খায়বারের গণীমত কেবল তারাই পাবে। قُل لَّن تَتَّبِعُونَا বলো, তোমরা কখনই আমাদের সাথে যেতে পারবেনাঃ এই বাক্যটি নাবাচক হলেও তা নিষেধাজ্ঞা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। لاتتبعونا অর্থাৎ আমাদের সাথে তোমরা বের হয়োনা। আল্লাহ তো আগেই এই কথা বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি হুদায়বিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আগেই ওয়াদা করেছিলেন যে, পরের বছর খায়বারের যুদ্ধে যেই গণীমত হাসিল হবে, তা কেবল হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের জন্যই।

উক্ত আয়াতে কারীমা থেকে জানা গেল যে, আল্লাহর জন্য কালাম ও কাওল তথা কথা বলা বিশেষণ সুসাব্যস্ত।[4] আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন ইচ্ছা কথা বলেন। আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন করা জায়েয নেই। আল্লাহর কালামের উপর আমল করা আবশ্যক এবং তার অনুসরণ করা জরুরী।

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ হে নবী! তোমার রবের কিতাবের মধ্য থেকে যা কিছু তোমার উপর অহী করা হয়েছে তা তুমি পাঠ করে শুনিয়ে দাওঃ আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর উপর অহী স্বরূপ যেই কিতাব নাযিল করেছেন, তা সর্বদা তেলাওয়াত করার আদেশ করেছেন। দ্রুত এবং অতি সংগোপনে জানিয়ে দেয়াকে অহী বলা হয়।[5] উসূলে তাফসীরের কিতাবগুলোতে অহীর বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। من كتاب ربك এই বাক্যটি ঐ বিষয়ের বর্ণনা স্বরূপ, যা তাঁর নিকট অহী করা হয়েছে।

لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ তাঁর কালেমা (কথা) পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেইঃ অর্থাৎ তাঁর কথার কোন পরিবর্তনকারী, বিকৃতকারী এবং অপসারণকারী নেই। মোট কথা এই আয়াতেও আল্লাহ তাআলার জন্য কালেমা সাব্যস্ত করা হয়েছে।

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ এই কুরআন বনী ইসরাঈলের বেশির ভাগ স্বরূপ বর্ণনা করেঃ তাওরাত ও

ইঞ্জিলের অধিকারীদেরকে বনী ইসরাঈল বলা হয়। তারা হচ্ছে ইহুদী ও নাসারা।

الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ যেগুলোতে তারা মতভেদ করেঃ তারা ঈসার ব্যাপারে মতভেদ করেছে। ইহুদীরা ঈসা (আঃ)কে অবৈধ সন্তান বলে অপবাদ দিয়েছে। আর খৃষ্টানরা তাঁকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। কুরআন তাঁর বিষয়ে মধ্যম পন্থা নিয়ে এসেছে। সত্য কথা হলো তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর কালেমা। যা তিনি মারইয়াম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি আল্লাহর একটি রূহ। অর্থাৎ আল্লাহর ঐ সমস্ত রূহের অন্তর্ভূক্ত, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।

এই আয়াতে কারীমা থেকেও প্রমাণ মিলে যে, কুরআন আল্লাহ তাআলার কালাম। কুরআনের মধ্যে পূর্বের সমস্ত কিতাবের খবর রয়েছে এবং আহলে কিতাবদের ফির্কাসমূহের মধ্যে যেসব বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, কুরআন ইনসাফের সাথে সেসব বিষয়ের ফয়সালাকারী। আর এ সব বিষয় আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে আসা অসম্ভব। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রঃ) যে আয়াতগুলো এখানে উল্লেখ করেছেন, সেগুলো আল্লাহর জন্য কালাম সাব্যস্ত করেছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাজহাব হচ্ছে, কুরআন ও সুন্নাহ যেহেতু প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ তাআলা কথা বলা বিশেষণে বিশেষিত, তাই তারা আল্লাহর জন্য উহা সাব্যস্ত করে। কালাম (কথা বলা) আল্লাহ তাআলার সিফাতে যাতীয়া বা সত্তাগত সিফাতের অন্তর্ভূক্ত। কেননা তিনি এর দ্বারা বিশেষিত এবং তাঁর সাথে উহা কায়েম রয়েছে। আরেক দিক থেকে কালাম সিফাতে ফেলিয়া বা কর্মগত সিফাতের অন্তর্ভূক্ত। কারণ তা আল্লাহর ইচ্ছা ও কুদরত অনুযায়ী সংঘটিত হয়। তিনি যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা এবং যে বিষয়ে ইচ্ছা কথা বলেন। তাঁর কালাম আগেও ছিল, এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কারণ তিনি চিরন্তন, চিরস্থায়ী এবং অবিনশ্বর। তিনি কামেল তথা সকল দিক থেকে পরিপূর্ণ। আল্লাহর কালাম তাঁর সিফাতে কামালিয়ার অন্তর্ভূক্ত। কেননা আল্লাহ তাআলা নিজের সত্তাকে কালাম (কথা বলা) বিশেষণে বিশেষিত করেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও পবিত্র সুন্নাতে তা দ্বারা আল্লাহ তাআলাকে বিশেষিত করেছেন। এই বিষয়ে বিরোধীদের মাজহাব এবং তার জবাব অচিরেই আসবে ইনশা-আল্লাহ।

ফুটনোট

[1] - কিয়ামতের দিনও আল্লাহ তাআলা আদমের সাথে কথা বলবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন আদমকে বলবেনঃ হে আদম! আদম বলবেনঃ আমি হাজির আছি, প্রস্তুত আছি। সব কল্যাণ তোমার হাতেই। আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ দিবেনঃ জাহান্নামী দলকে বের কর। আদম বলবেনঃ জাহান্নামী দলের সংখ্যা কত? আল্লাহ্ বলবেনঃ প্রতি হাজারে নয়শ নিরানববই জন। সে সময় (চরম ভয়াবহ অবস্থার কারণে) শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, প্রত্যেক গর্ভবতীর গর্ভপাত হয়ে যাবে। তুমি মানুষকে মাতালের মত দেখতে পাবে। অথচ তারা মাতাল নয়। কিন্তু আল্লাহর আযাব অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। সাহাবীগণ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! সেই একজন আমাদের মধ্যে কে হবেন? তিনি বললেনঃ তোমরা আনন্দিত হও। তোমাদের মধ্য থেকে হবে একজন এবং ইয়াজুজ-মা’জুজ থেকে হবে বাকী নয়শত নিরানববই জন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! আমি আশা করি জান্নাতবাসীর চারভাগের একভাগ হবে তোমরা। একথা শুনে আমরা তাকবীর পাঠ করলাম। তারপর তিনি বললেনঃ আমার আশা, তোমরাই হবে জান্নাতবাসীর তিনভাগের একভাগ। একথা শুনে আমরা তাকবীর পাঠ করলাম। তারপর তিনি বললেনঃ আমার

আশা, তোমরাই হবে জান্নাতবাসীর অর্ধেক। এবারও আমরা উঁচু আওয়াজে তাকবীর ধ্বনি দিলাম। অতঃপর তিনি বললেনঃ তোমরা তো অন্যান্য লোকদের তুলনায় একটি সাদা বলদের চামড়ায় একটি কালো লোমের ন্যায় অথবা একটি কালো বলদের চামড়ায় একটি সাদা লোমের ন্যায়।

[2] -আলেমগণ বলেনঃ আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন প্রতিটি মানুষকে দু’টি প্রশ্ন করবেন। (১) ما كنتم تعبدون؟ “তোমরা দুনিয়াতে কার এবাদত করতে?” (২) ماذا أجبتم المرسلين তোমরা রাসূলদের জবাবে কী বলেছিলে?

[3] - আল্লাহর কালাম ও ডাক যেমন হয় দুনিয়াতে, তেমনি হয় আখেরাতে। তিনি দুনিয়াতে কোন কোন নবী-রাসূলের সাথে কথা বলেছেন। আখেরাতেও মাখলুকের সাথে কথা বলবেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ কথা বলা ও ডাক দেয়ার বিষয়টি তাঁর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত। তিনি যখন যার সাথে কথা বলার ইচ্ছা করেন তথন তার সাথে কথা বলেন এবং যা বলার ইচ্ছা করেন তাই বলেন।

[4] - কুরআন আল্লাহর কালাম; ইহা আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্ট বস্ত্তর মত নয়। কুরআন আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে এবং আল্লাহর নিকট ফিরে যাবে। উপরে উল্লেখিত দলীলগুলো সে কথারই প্রমাণ করে। সাহাবী, তাবেঈ, সালাফে সালেহীন এবং সম্মানিত ইমামগণের মতও তাই। সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে কুরআন আল্লাহর কালাম। তবে মুতাযেলা এবং আহলে সুন্নাতের মধ্যে এই মাসআলাটি নিয়ে বিরাট মতভেদ রয়েছে। এই মতভেদের কারণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকদের বিরাট ক্ষতি হয়েছে। আহলে সুন্নাতের ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রঃ) এই মাসআলার কারণেই কঠোর নির্যাতন সহ্য করেছেন।

কতিপয় আলেম বলেন, রিদ্দার যুদ্ধের দিন আল্লাহ তাআলা আবু বকর (রাঃ)এর মাধ্যমে যেমন ইসলামের হেফাযত ও সাহায্য করেছেন তেমনি যেদিন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের উপর নির্যাতন চালানো হয়েছিল সেদিন তার মাধ্যমে ইসলামের হেফাজত করেছেন।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল যে ফিতনায় পড়েছিলেন, তার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, আববাসী খলীফা মামুনুর রশিদের যুগে মুতাযেলা আলেমদের খুব প্রভাব ছিল। তাদের প্রভাবে স্বয়ং খলীফা মামুনও প্রভাবিত হয়ে গিয়েছিলেন। মুতাযেলাদের মতে কুরআন আল্লাহর মাখলুক। তারা খলীফাকে এই কথা বুঝাতে সক্ষম হয়েছিল। তাই খলীফা মামুন মানুষকে এই মতবাদ মানতে বাধ্য করলেন। তার কথার সাথে যেসব আলেম অমত পোষণ করতেন, তিনি তাদের উপর নির্যাতন চালাতেন এবং হত্যা করতেন। অধিকাংশ আলেম তখন মনে করলেন যে, বল প্রয়োগ করে যেহেতু কুরআনকে মাখলুক বলতে বাধ্য করা হচ্ছে এবং তা না বললে তাদের উপর নির্যাতন চালানো হয়, তাই বাধ্য হয়ে তারা খলীফার কথা মেনে নিলেন। বিশেষ করে যখন ইসলামে এই সুযোগ রয়েছে যে, বাধ্য হয়ে কুফুরী বাক্য উচ্চারণ করলে কোন মুসলিম কাফের হয়ে যায়না। ঈমানের দ্বারা অন্তর পরিপূর্ণ রেখে জান চলে যাওয়ার কিংবা নির্যাতনের ভয়ে মুখে কুফুরী বাক্য উচ্চারণ করলে তা জায়েয রাখা হয়েছে এবং এই অবস্থায় কুফুরী বাক্য উচ্চারণকারীকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।

তাই এক পর্যায়ে অধিকাংশ আলেম মাসআলাটিকে এই পর্যায়ে রেখে স্বীকার করে নিলেন যে, কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি। তবে সেখানে এমন কিছু আলেম থাকার কথাও উড়িয়ে দেয়া যায়না, যারা কেবল খলীফার নৈকট্য ও পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্যই কুরআনকে মাখলুক বলেছিল।

কিন্তু ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল এবং মুহাম্মাদ বিন নূহ (রঃ) কুরআনকে মাখলুক বলতে অস্বীকার করলেন। তারা উভয়েই বললেনঃ কুরআন আল্লাহর কালাম। আল্লাহর নিকট থেকে ইহা নাযিল হয়েছে। ইহা অন্যান্য সৃষ্টির মত সৃষ্ট জিনিষ নয়; বরং তা আল্লাহর কালাম ও সিফাত। তারা মনে করলেনঃ বাধ্য হয়ে যেসব মাসআলায় সত্যের বিপরীত বলা যায়, এটি সেরকম কোন সাধারণ ও ব্যক্তিগত মাসআলা নয়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে তাদের জন্য সেই সুযোগ গ্রহণ করা জায়েয নেই। কারণ এই মাসআলাটি ব্যক্তিগত মাসআলা নয়, যাতে বাধ্য হয়ে সত্যের খেলাফ বললে ক্ষমা করে দেয়া হবে। যেসব মাসআলার সম্পর্ক ইসলামী শরীয়তের সংরক্ষণের সাথে, সেখানে নিজের গর্দান বিসর্জন দিয়ে হলেও মুসলিমরা কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের হেফাজত করবে।

সুতরাং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রঃ) যদি তখন নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য এবং বাধ্য হয়ে এই কথা বলতেন যে, কুরআন আল্লাহর মাখলুক, তখন সকল মানুষই বলতো, কুরআন আল্লাহর মাখলুক। নির্যাতনের ভয়ে এই কথা বলা হলে ইসলামী সমাজ পরিবর্তন হয়ে যেত এবং একটি চিরসত্য ইসলামী আকীদাহ হয়ত মুসলিমগণ হারিয়ে ফেলতেন। তাই তিনি খলীফার কথায় সম্মতি না দিয়ে সত্য প্রকাশ করার সুদৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলেন এবং এই জন্য অমানবিক নির্যাতন ভোগ করলেন।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের ফিতনার বিষয়টি ভাল করে বুঝার জন্য আরেকটু খোলাসা করে লিখার প্রয়োজন অনুভব করছি। ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত সূত্রে বলা হয়েছে যে, মুতাযেলী আলেম আহমাদ বিন আবু দাউদ এবং বিশর আলমুরাইসী খলীফা মামুনকে পরামর্শ দিল, তিনি যেন রাজ্যের আলেমদেরকে এই কথা বলতে বাধ্য করেন যে, কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি। মামুন এতে রাজী হয়ে বাগদাদের পুলিশ প্রধান ইসহাক বিন ইবরাহীমকে দেশের সমস্ত বিজ্ঞ আলেমকে একত্র করার আদেশ দিলেন। ইসহাক সকল আলেমকে একত্র করে মামুনের চিঠি পড়ে শুনালেন এবং কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি,- এ কথা বলার আহবান জানালেন। সেই সাথে এই কথাও জানিয়ে দেয়া হলো যে, খলীফার আদেশ অমান্য করে যেই আলেম কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলবে, তাকে সরকারী পদ থেকে বহিস্কার করা হবে এবং মামুনের অনুদান থেকেও বঞ্চিত করা হবে। উল্লেখ্য যে, খলীফার আদেশ অমান্য করার ভয়াবহ পরিণতির কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো।

এখান থেকেই ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ইমামকে অন্যান্য আলেমের সাথে ইসহাকের কার্যালয়ে হাজির করা হলো। আলেমগণ এক এক করে সকলেই নির্যাতনের ভয়ে কুরআনকে মাখলুক বলা শুরু করলেন। কিন্তু ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল এই অবস্থা দেখে ক্রোধে ফেটে পড়লেন এবং ক্রোধে তাঁর চেহারা ও চোখ লাল হয়ে গেল। অথচ এর আগে তিনি ছিলেন একজন নরম ও কোমল প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু তাঁর সেই নরম স্বভাব চলে গেল এবং তিনি আল্লাহর জন্য রাগান্বিত হলেন। এটি ছিল সেই দিনের ঘটনা। অতঃপর তিনি তাঁর মসজিদে ফিরে এলেন এবং পাঠ দানে নিয়োজিত হলেন। লোকেরা এরপর থেকে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালকে এই মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। প্রথম দিকে তিনি এই মাসআলার জবাব

দিতে অস্বীকার করতেন। কিন্তু ফিতনাটি যখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল, তখন মানুষ জেনে ফেলল যে, কোন্ কোন্ আলেম এই মাসআলায় খলীফার মর্জী মোতাবেক ফতোয়া দিয়েছেন এবং কোন্ কোন্ আলেম খলীফার বিরোধীতা করেছেন।

খলীফা মামুনের কাছেও খবর পৌঁছে গেল। তিনি তখন বাইজানটাইনের সীমান্তবর্তী অঞ্চল তারতুসে অবস্থান করছিলেন। তিনি পুলিশ প্রধান ইসহাককে দ্বিতীয়বার আলেমদের সাথে বসার আদেশ দিলেন এবং যারা কুরআনকে আল্লাহর সৃষ্টি না বলে আল্লাহর কালাম বলবে, তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়ার আদেশ করলেন। ইসহাক তাই করলেন। এতে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ও মুহাম্মাদ বিন নুহ ব্যতীত সকলেই খলীফার কথা মেনে নিল। এক পর্যায়ে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল এবং মুহাম্মাদ বিন নুহকে জেলে বন্দী করা হলো। ইসহাক শপথ করে বললঃ তারা যদি কুরআনকে মাখলুক বলতে নারাজ হয়, তা হলে সে উভয়কে নিজ হাতে হত্যা করবে। এ জন্য সে তলোয়ার উঁচিয়ে ভয় দেখালো। কিন্তু তারা উভয়েই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

এইবার ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালকে বাগদাদ থেকে তারতুসে তথা যেখানে খলীফা মামুন অবস্থান করছিলেন, সেখানে নিয়ে যাওয়ার আদেশ করা হলো। তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। যাওয়ার পথে অনেক ঘটনাই ঘটে যায়। এসব ঘটনা ইমামকে সত্যের উপর দৃঢ়পদ থাকতে সহায়তা করেছিল। এ সময় সমস্ত মানুষের দৃষ্টি ছিল ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের দিকে। তিনি কী বলেন, তারা তার অপেক্ষায় ছিল। লোকেরা তাকে এই মাসআলায় সত্যের উপর অটল থাকতে সাহস দিতেন।

ইতিহাস প্রমাণ করে যে, তারতুসে যাওয়ার পথে ইরাকের একজন গ্রাম্য লোক তাঁর সাথে দেখা করে এই বলে সাহস দিল যে, হে ইমাম আহমাদ! আপনি সত্যের পথেই আছেন। সুতরাং আপনি অটল থাকুন। আপনাকে যদি হত্যাও করা হয়, তাহলেও আপনি খলীফার কথায় সম্মতি দিবন না। শহীদ হয়ে মৃত্যু বরণ করুন। আর বেঁচে থাকলে সম্মানিত ও প্রশংসিত হয়ে বেঁচে থাকুন। এই দুনিয়াতে নিহত হয়ে পরকালে জান্নাতে যাওয়াই আপনার জন্য ভাল। এসব কথা শুনে ইমামের মনোবল বৃদ্ধি পেত এবং তাঁর ঈমান মজবুত হতো।

এমনিভাবে তারতুস যাওয়ার পথে ইমাম আহমাদের অন্যতম সাথী আবু জা’ফর আলআম্বারী ফুরাত নদী পার হয়ে ইমামের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেন। ইমাম তাকে দেখে বললেনঃ হে আবু জা’ফর! এত কষ্ট করে আমার সাথে দেখা করতে আসার কী প্রয়োজন ছিল? জবাবে আবু জা’ফর বললেনঃ ওহে আহমাদ! শুন! তুমি আজ মানুষের নয়ন মনি, তুমি সকলের মাথা! মানুষ তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। তারা তোমার অনুসরণ করবে। আল্লাহর কসম! তুমি যদি কুরআনকে মাখলুক বলো, তাহলে আল্লাহর বান্দারা তাই বলবে। আর তুমি যদি তা বলতে অস্বীকার করো, তাহলে অগণিত মানুষ কুরআনকে মাখলুক বলা হতে বিরত থাকবে। হে বন্ধু! ভাল করে শুন। খলীফা যদি তোমাকে এইবার হত্যা নাও করে, তাহলে তুমি একদিন মৃত্যু বরণ করবে। মরণ একদিন আসবেই। সুতরাং তুমি আল্লাহকে ভয় করো। খলীফার কথায় তুমি কুরআনকে সৃষ্টি বলতে যেয়োনা।

কথাগুলো শুনে ইমাম আহমাদ কাঁদতে লাগলেন এবং বললেনঃ ما شاء الله আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তাই হবে। অতঃপর তিনি বললেনঃ হে আবু জা’ফর! কথাগুলো তুমি আরেকবার বলো। আবু জা’ফর কথাগুলো পুনরাবৃত্তি

করলেন। এবারও ইমাম কাঁদলেন এবং বললেনঃ ما شاء الله

তারতুস যাওয়ার পথে ইমাম আহমাদ গভীর রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন এবং আল্লাহর কাছে এই বলে দুআ করতেনঃ আল্লাহ যেন তাঁকে মামুনের সামনে হাজির না করেন এবং মামুনকে যেন না দেখান। দুআয় তিনি এই কথা বারবার বলতেন। আল্লাহর কী অপার মহিমা যে, তারতুস পৌঁছার আগেই বিনা অসুখে মামুন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এটি ছিল ২১৮ হিজরী সালের রজব মাসের ঘটনা।

মামুনের মৃত্যু সংবাদ আসার পর রক্ষীরা ইমামকে মুহাম্মাদ নুহএর সাথে বাগদাদের জেলে ফেরত নিয়ে আসল। মামুনের পরে মুতাসেম খলীফা নিযুক্ত হলেন। মুতাসেম যদিও মুতাযেলা মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু মামুনের গৃহীত নীতি থেকে ফিরে আসাও তার পক্ষে সম্ভব ছিলনা। কারণ খলীফা মামুন মুতাসেমকে মুতাযেলা মতাদর্শের উপর অটল থাকার অসীয়তও করেছিলেন। তাই মামুনের প্রতি মুতাসেমের অগাধ ভালবাসার কারণেই মুতাসেম খলীফা হয়ে সর্বপ্রথম যে সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেন তা হলো তিনি ইমাম আহমাদকে হাত-পা বেঁধে বাগদাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি জেলে ফেলে রাখলেন। তাতে তিনি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ফলে বাগদাদের বড় জেলে সাধারণ কয়েদীদের সাথে স্থানান্তর করা হলো। এখানে তিনি ত্রিশ মাস অবস্থান করেন। এরই মধ্যে দীর্ঘ কারাভোগ এবং নির্যাতনের কারণে জেলের মধ্যেই মুহাম্মাদ বিন নূহ মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ইমাম আহমাদ একাই ময়দানে বাতিলের মোকাবেলা করতে থাকলেন।

জেলের মধ্যে মুতাযেলা সম্প্রদায়ের বড় বড় আলেমরা প্রবেশ করে ইমামের সাথে খালকে কুরআনের মাসআলায় তর্কে লিপ্ত হতো এবং যুক্তি ও দলীল-প্রমাণ পেশ করতো। কিন্তু ইমাম আহমাদের যুক্তি-প্রমাণ সবসময়ই মুতাযেলাদের যুক্তি-প্রমাণের উপর জয়লাভ করতো। যতবারই ইমাম আহমাদ যুক্তি-তর্কে মুতাযেলা আলেমদের উপর জয়লাভ করতেন, ততবারই তার উপর যুলুমের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়া হতো। এভাবে কিছুদিন পার হওয়ার পর খলীফা মুতাসেমের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে বিতর্কের আয়োজন করা হলো।

প্রিয় পাঠক! আপনি পরিস্থিতির ভয়াবহতার প্রতি একটু খেয়াল করুন। একদিকে ইমাম আহমাদ একা। অন্যদিকে খলীফা। খলীফার সাথে রয়েছে বিদআতী আলেমগণ, মন্ত্রীপরিষদ, রাষ্ট্রের উপরস্থ সেনা কর্মকর্তাগণ, পুলিশবাহিনী এবং জল্লাদের দল। বিতর্কের শুরুতে খলীফা নিজেই ইমামকে নরম করার চেষ্টা করতেন এবং কুরআনকে মাখলুক বলে ফতোয়া জারী করার জন্য উৎসাহ দিতেন। অতঃপর মুতাযেলী আলেমদেরকে তার সাথে তর্ক করার আদেশ দিতেন। কিন্তু ইমাম আহমাদ কুরআন, হাদীছ দিয়ে দলীল পেশ করে সকলকে পরাজিত করে দিতেন। বিদআতীরা দার্শনিকদের যুক্তি পেশ করতো। ইমাম আহমাদের দলীল তাদের কথার উপর জয়লাভ করতো। তিনি বলতেনঃ আমাকে কুরআন ও সুন্নাহর একটি দলীল দিয়ে বুঝিয়ে দাও যে কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি।

ঐদিকে পুলিশ প্রধান আব্দুর রাহমান বিন ইসহাক বিন ইবরাহীম বলতেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালকে ত্রিশ বছর যাবৎ চিনি। তিনি আপনার আনুগত্য করাকে ওয়াজিব মনে করেন, আপনার শাসনকে সমর্থন করেন এবং আপনার সাথে জিহাদ করাকে ফরয মনে করেন। সেই সাথে তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম এবং ফকীহ।

অপর দিকে আহমাদ বিন দাউদ এবং অন্যান্য বিদআতীরা খলীফাকে ইমামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলত এবং বুঝাতো যে, ইমাম আহমাদ একজন গোমরাহ, কাফের এবং বিদআতী।

এভাবে বিতর্ক দীর্ঘ হওয়ার কারণে খলীফা মুতাসেম বিরক্তিবোধ করতে লাগলেন। কিন্তু বিদআতী আলেম আহমাদ বিন দাউদ খলীফাকে পুনরায় ইমাম আহমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলল। তাই আহমাদ বিন দাউদের প্ররোচনায় এবং উৎসাহে ইমামকে চাবুক মারা শুরু হলো। ইমামের দৃঢ়তা দেখে স্বয়ং খলীফা আশ্চর্যবোধ করলেন এবং ইমামের উপর তাঁর দয়ার উদ্রেক হলো। তৎক্ষণাৎ আহমাদ বিন দাউদ বলতে লাগলঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি যদি তাঁকে ছেড়ে দেন, তাহলে লোকেরা বলাবলি করবে যে, ইমাম আহমাদের সামনে দুইজন আববাসী খলীফা পরাজয় বরণ করেছে। এই নিকৃষ্ট কথাটির কারণে খলীফা পূর্বের অবস্থানে ফিরে যায় এবং জল্লাদরা তার আদেশে ইমামকে পুনরায় বেত্রাঘাত শুরু করে দেয়।

এভাবে জল্লাদরা পালাক্রমে তাঁর শরীরকে বেত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলল। সতেরবার বেত্রাঘাত করার পর সেই দিন খলীফা মুতাসেম ইমাম আহমাদকে বললেনঃ হে আহমাদ! কী কারণে আপনি এভাবে নিজের জান শেষ করছেন? আল্লাহর কসম! আমি আপনার উপর দয়া করতে চাই, কিন্তু.........।

ঐ সময় আববাসীয় খেলাফতের একজন তুর্কী সেনাপতি স্বীয় তরবারি দ্বারা ইমামের শরীরে গুঁতা মেরে বললঃ তুমি কি এই সব মানুষকে পরাজিত করতে চাও? আরেকজন বললঃ মরণ হোক তোমার! তোমার খলীফা আমীরুল মুমিনীন তোমার মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে। অথচ তুমি তার কথা অমান্য করছো? আরেকজন বলে উঠলঃ হে আমীরুল মুমিনীন! একে হত্যা করে ফেলুন। অন্য একজন বললঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি রোজাদার অবস্থায় রোদ্রে দাঁড়িয়ে কষ্ট করছেন? তাকে হত্যা করে ফেলুন এবং নিজেকে শান্ত করুন। এমনি আরো অনেক কথাই হয়ত সেদিন হয়েছিল সেখানে।

পরিশেষে খলীফা মুতাসেম ইমামকে লক্ষ্য করে বললেনঃ হে আহমাদ! আফসোস আপনার জন্য! আমাদের কথার জবাব দিন। ইমাম অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেনঃ আমার কাছে কুরআন থেকে অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত থেকে একটি দলীল নিয়ে আসুন। আমি আপনাদের কথার সাথে একমত হবো। এতে তাঁর শরীরে পুনরায় বেত্রাঘাত শুরু করা হলো। অতঃপর ইমামকে লক্ষ্য করে খলীফা মুতাসেম বললেনঃ আমার কথাকে সরাসরি সমর্থন না করলেও আপনি এমন একটি কথা বলুন, যাতে আমি সামান্যতম সন্তুষ্ট হতে পারি এবং আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু ইমাম তাঁর অবস্থান থেকে সামান্যতম পিছপা হলেন না।

জল্লাদরা তাঁর উপর বেত্রাঘাত অব্যাহত রাখলো এবং কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি, -এ কথা জোর করে তাঁর থেকে আদায় করার সর্বপ্রকার চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুতেই লাভ হলোনা। পরিশেষে খলীফা ইমামের পর্বত সদৃশ দৃঢ়তা দেখে তাঁর আত্মীয় স্বজনকে ডেকে এনে সকলের সামনে মুক্ত করে দিলেন। মুক্ত করার আগে ইমামের আত্মীয় স্বজন থেকে এই মর্মে স্বীকারোক্তি নিলেন যে, ইমামকে তারা সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় বুঝে নিচ্ছে। এই স্বীকারোক্তি নেয়ার কারণ হলো খলীফার ভয় ছিল, সাধারণ লোকেরা যদি জানতে পারে যে তাদের প্রাণপ্রিয় ইমামকে নির্যাতন করা হয়েছে, তাহলে তারা খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল মুক্তি পেলেন, কিন্তু মুতাযেলা ও বিদআতী আলেমদের দাপটের কারণে নির্বিঘ্নে সত্যের দাওয়াত প্রচারের মত পরিবেশ ছিলনা। তাই তিনি প্রতিকূল পরিবেশের মোকাবেলা জুমআ ও জামআতে হাজির হতেন, মানুষকে হাদীছ ও সুন্নাতের দারস প্রদান করতেন এবং ফতোয়া দিতেন।

এরই মধ্যে মুতাসেম মৃত্যু বরণ করে এবং তার পুত্র ওয়াছেক খলীফা হয়। সেও তার পূর্ব পুরুষের ন্যায় মুতাযেলা মতবাদ ও বিদআতের পৃষ্ঠপোষক ছিল। ২৩১ হিজরী সালে ওয়াছেকের মৃত্যু হলে মুতাওয়াক্কিল খলীফা নিযুক্ত হন। মুতাওয়াক্কিল খলীফা হওয়ার সাথে সাথেই ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের দাওয়াতের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। কারণ মুতাওয়াক্কিল আহলে সুন্নাতের মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন। তাই তিনি বিদআতীদের পথ সংকীর্ণ করে ইমাম আহমাদসহ সকল সুন্নী আলেমদের পথ প্রশস্ত করে দিলেন।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রঃ) যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং তিনি যেই যুলুম নির্যাতন সহ্য করে সত্যের পতাকাকে সমুন্নত রেখেছেন, তাতে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তিনি এমন একটি বিদআতের মোকাবেলায় সত্য বলেছেন, যেই বিদআতকে পরপর তিনজন খলীফা পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন, তাদের সাথে ছিলেন সমস্ত বিদআতী আলেম, রাজ্যের সকল মন্ত্রী, বিচারক এবং সশস্ত্র বাহিনী। অপর দিকে ইমাম আহমাদ ছিলেন একা। একাই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং জেল-যুলুম সহ্য করে সত্যকে জয়যুক্ত করেছেন। তিনি যখন যুলুম-নির্যাতন সহ্য করছিলেন, তখন লোকেরা তাঁর কাছে এসে আবেদন করছিল যে, আমাদের যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমরা খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আপনাকে মুক্ত করবো। কিন্তু ইমাম তাতে সম্মতি দেন নি। বরং নিজে একাই যুলুম-নির্যাতন সহ্য করতে লাগলেন এবং মুসলিমদেরকে সবর করার আদেশ দিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, বিদ্রোহ করে তাঁকে মুক্ত করতে গেলে অসংখ্য মানুষের রক্তপাত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হবে বেশী। তাই তিনি সবর করলেন, দলীল-প্রমাণ পেশ করার পথকেই বেছে নিলেন এবং এ পথেই ভাল ফল হবে মনে করলেন। বাস্তবেও তাই হয়েছিল।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের এই পরীক্ষা থেকে দ্বীনের দাঈ ও আলেমদেরকেও শিক্ষা নিতে হবে। তারা যেন পরিস্থিতির প্রতিকূলতা, জেল-যুলুম এবং নির্যাতনের ভয়ে বিদআত ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের সামনে মুখ বন্ধ করে বসে না থাকেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের মত সৎসাহস ও পর্বত সদৃশ মনোবল এবং সাহস নিয়ে সুন্নাত ও সত্যের দাওয়াতকে কিয়ামত পর্যন্ত সমুন্নত রাখতে হবে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সেই তাওফীক দাও। আমীন। তথ্যসূত্রঃ সিয়ারু আলামিন নুবলা এবং অন্যান্য গ্রন্থ।

[5] - আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলদের মাধ্যমে সৃষ্টির জন্য যে দ্বীন ও শরীয়ত পাঠিয়েছেন, তাকে শরীয়তের পরিভাষায় অহী বলা হয়।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8507

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন